সুলা

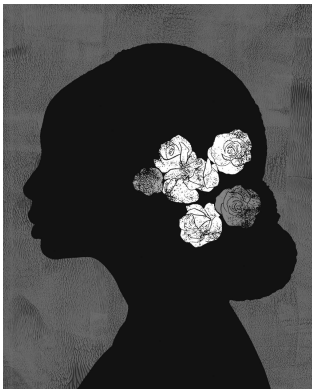

সুলা

SULA

টনি মরিসন

Toni Morrison

ভাষান্তর

নাহার তৃণা

সুলা
টনি মরিসন
ভাষান্তর : নাহার তৃণা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Sula by Toni Morrison translated by Nahar Trina Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98813-7-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার বোনেদের—
যারা
'আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি।'

লেখকের অন্যান্য বই

স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট (গল্পগ্রন্থ, ফেব্রুয়ারি, ২০২০)
একডজন ভিনদেশি গপ্পো (শিশুতোষ অনুবাদ গল্প, ফেব্রুয়ারি ২০২০)
দূরদেশের গল্প (অনুবাদ গল্পগ্রন্থ, ফেব্রুয়ারি, ২০২২)
নো ওয়ান কিল্ড জেসিকা ও অন্যান্য গল্প (গল্পগ্রন্থ, নভেম্বর, ২০২২)
ভিনদেশি গপ্পো (শিশুতোষ অনুবাদ গল্প, জানুয়ারি, ২০২৩)
মৃত্যু পেরিয়ে জীবন : এক আমেরিকান মিশনারির একাত্তরের স্মৃতি (অনুবাদ স্মৃতিকথা, নভেম্বর, ২০২৩)
ই-বই কবন্ধ সময় (গল্পগ্রন্থ, প্রকাশক কিতাব-ই, ডিসেম্বর ২০২২)
ই-বই সিনেমার দিন রাত (সিনেমা নিয়ে লেখাজোখা, বইয়ের হাট প্রকাশনী, অক্টোবর, ২০২২)

সম্পাদিত বই

গল্পপাঠ নির্বাচিত জাপানি গল্প সংকলন (যৌথ সম্পাদনা; ফেব্রুয়ারি ২০২২, কবি প্রকাশনী)
গল্পপাঠ নির্বাচিত স্প্যানিশ গল্প সংকলন (যৌথ সম্পাদনা; মে ২০২২, কবি প্রকাশনী)
গল্প পঞ্চাশৎ (সম্পাদনা; ২০২৪, কবি প্রকাশনী)
গল্পপাঠ নির্বাচিত নাইয়ার মাসুদের গল্প সংকলন (যৌথ সম্পাদনা; অমর একুশে বইমেলা ২০২৪, কবি প্রকাশনী)

টনি মরিসনের বিচরণ—নৈতিকতার দ্বান্দ্বিক সমচ্ছেদে

বিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন কবি ল্যাংস্টন হিউজ লিখেছিলেন :

'আমি চিনেছি বহু নদী,
আমি চিনেছি সেসব নদী যারা পৃথিবীর মতো প্রাচীন
আর মানব শিরায় মানব রক্তের চেয়ে যারা পুরনো,
আমার আত্মা হয়েছে নদীর মতো গভীর।'

নদীর মতো গভীর একটি রেখা, সাহিত্যের একটি রেখা, বয়ে চলে পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমাদের সবাইকে একটি নিগড়ে বেঁধে। সেই সুবর্ণ শৃঙ্খলে বাঙালি পাঠকও নিজেকে বেঁধে নেন, পরিচিত হন কোনো সুদূরের এক সমাজের সাথে। ল্যাংস্টন হিউজের হৃদয় টনি মরিসন ধারণ করেন, কিন্তু হিউজের সরল কাব্যিক গভীরতাকে উত্তোরণ করেন এক আপসহীন গদ্যে যে গদ্য পাঠককে সহজে স্বস্তি দেয় না। মরিসনের এই ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা ইচ্ছাপ্রণোদিত, তিনি স্বঘোষিত মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নারী মানসের প্রতিনিধি, কিছুটা হয়তো সার্বিক নারী মননের উপস্থাপক। তাঁর লেখা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থানকে চিত্রিত করলেও সেটি হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন, তাই এই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মানুষটি আধুনিক সময়ে বিশ্বসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত। নাহার তৃণার এই অনুবাদটিও তাই মূল্যবান।

অনেকেই মনে করেন সময়ের হিসেবে বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্যে উইলিয়াম ফকনারের পরে টনি মরিসন হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক, কিন্তু শুধু লেখক হিসেবে নয়, তাত্ত্বিক সাহিত্য-সমালোচনায়ও তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। আমরা কথা বলি, কথা লিখি, আমাদের জীবনের মূল্য সেই কথার ভাষাই নির্ধারণ করে দেয়। মরিসনের মতে ভাষার দখলদারিত্ব যার হাতে থাকবে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সমাজ, আইন, শিক্ষা। লেখকের কর্তব্য হলো সেই নিয়ন্ত্রণ খর্ব করা, ভাষা দিয়ে জীবনের বৈচিত্র্য, জীবনযাপনের পার্থক্য তুলে ধরে একক নিয়মের কর্তৃত্বকে ভেঙে ফেলা। তাই তাঁর ভাষাকে তিনি কীভাবে উপস্থাপনা করবেন এবং সেটি কীভাবে ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে মরিসন চিন্তিত ছিলেন। ভাষার বিশেষ ব্যবহারে তিনি তাঁর চরিত্রদের মধ্য দিয়ে নারীত্বকে প্রকাশ করেছেন, প্রকাশ করেছেন তাঁদের কৃষ্ণাঙ্গতা, আবার কোনো সময়ে বর্ণ উহ্য রেখেছেন, আর এসবই করেছেন মার্কিন দেশের জটিল সামাজিক দর্পণের পাত্রে। তাঁর কাছে ভাষা ছিল আধ্যাত্মিক সাধনার উপাদান, তাঁর নোবেল বক্তৃতায় বলেছিলেন—'Language

alone protects us from the scariness of things with no names. Language alone is meditation.'

টনি মরিসন Random House প্রকাশনা সংস্থায় একজন জ্যেষ্ঠ এডিটর হিসেবে কাজ করতেন, দুটি সন্তানের ভরণপোষণেরও ভার ছিল, দিনের বেলা কাজ করে রাতে গল্প লিখতেন তাঁর মতো মানুষদের নিয়ে। কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস The Bluest Eye প্রথমে প্রায় অলক্ষিতই থেকে গিয়েছিল। সাহিত্যে মূল মার্কিন ধারা বলতে যা বোঝায় সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ লেখনীর যে ভিন্নতা এবং বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের অস্তিত্বকে স্থাপন করানো কঠিন ছিল। কিন্তু মরিসন তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ-মার্কিন সাহিত্যিক পরিচয়কেই তুলে ধরতে চেয়েছেন পৃথিবীর কাছে, সেই পরিচয়টা ছিল তাঁর কাছে মুখ্য, তাঁর প্রতিটি লেখাই সেই সাক্ষ্য বহন করে। এই কাজটি তিনি করেছেন অতীব গুরুত্ব নিয়ে, একটা তাত্ত্বিক পটভূমি সৃষ্টি করে। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একক ব্যক্তির দ্বন্দ্ব এবং সেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার প্রক্রিয়ায় সামাজিক প্রথাকে লঙ্ঘন করার জন্য সেই ব্যক্তির যে স্পৃহা সেটি তাঁর লেখায় বারে বারে এসেছে। এই দ্বান্দ্বিক কাঠামোতে যেমন শ্বেতাঙ্গ সমাজের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে, তেমনই আছে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের ওপর আরোপিত রীতিনীতির সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ কোনোভাবেই প্রীতিকর বলা যাবে না, টনি মরিসন পড়তে গিয়ে পাঠকের মধ্যে কদাচিৎ প্রীতির ভাব উদয় হবে। এর মূল কারণ হলো মরিসন তাঁর কাজের প্রতি সৎ থেকেছেন, সত্য থেকে নিজেকে কখনোই ফিরিয়ে নেননি।

বাঙালি পাঠকের জন্য টনি মরিসনের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগৎকে নিয়ে আসবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় দাসপ্রথা বিলুপ্ত হলেও বিংশ শতাব্দীর একটা বড় অংশ জুড়ে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ তার সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। ইতিহাসের সেই বঞ্চনা ওই সমাজকে এমন গভীরভাবে আঘাত করে যে তার উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হয়, মরিসনের আখ্যান এই প্রেক্ষাপটে রচিত। কিন্তু সেটি কোনো রাজনৈতিক নথি নয়, বরং সত্যের সুতো থেকে সূক্ষ্মভাবে বোনা এক জটিল নকশিকাঁথা যা কিনা কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ ও তার অনুষঙ্গ হিসেবে শ্বেতাঙ্গ সমাজের স্তরগুলোকে একে একে উন্মোচন করেছে। তাঁর চরিত্ররা পরিশীলিত নয়, তাঁদের আবেগ আদিম, তাদের দুর্বলতা হৃদয়বিদারক, অসহায়তা অসহনীয়। মরিসনের অন্বেষণে এই জটিল নকশি বুননের এক পাশে আলো, অন্য পাশে অন্ধকার, যেখানে নিপীড়ণের আইডিয়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণাঙ্গ-মার্কিন অভিজ্ঞতার এক বহুমাত্রিক বর্ণালী উপস্থাপনা রচিত হয়েছে, যাকে transcendental বলা যায়। সেখানে একদিকে রয়েছে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, প্রেম, হঠকারি সিদ্ধান্ত অথবা বিশ্বাসঘতকতা, অন্যদিকে আছে পারিবারিক ও সামাজিক গতিময়তার মধ্যে সমন্বয় ও সংঘর্ষ। আমার বিশ্বাস এই অনুবাদ বইটি আমাদেরকে অনেক বাঁধাধরা ধারণার বাইরে নিয়ে আসবে, বাঙালি পাঠকের জন্য এটি যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনই প্রয়োজনীয়, তাঁর নিজের সমাজটিকে আতস কাচ নিয়ে দেখার জন্য।

নাহার তৃণা টনি মরিসনের 'সুলা' উপন্যাসটি বাংলা ভাষার পাঠকের জন্য অনুবাদ করেছেন।

'সুলা' উপন্যাসটি আফ্রিকান-আমেরিকান সাহিত্যের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ধরা হয়। উপন্যাসটি ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত, দুজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী সুলা পিস এবং নেল রাইটের বন্ধুত্ব ও দ্বন্দ্বকে ঘিরে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কাহিনি। তাঁর চরিত্রদের দ্বৈততা অন্বেষণ করতে গিয়ে মরিসন দেখিয়েছেন বন্ধুত্ব কেমন করে একই সাথে মুক্তি এবং বাধার উৎস হতে পারে। এখানে ব্যক্তিগত বা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নীতিগতভাবে ঠিক বা বেঠিকের প্রশ্ন এসেছে—'ভালো', 'মন্দ', 'বন্ধুত্ব', 'ভালোবাসা' এই সব বোধের অর্থ কী হতে পারে সেসব প্রশ্ন জাগবে, একজন দক্ষ গল্পকার হিসেবে এর উত্তর দার্শনিক যুক্তির আকারে মরিসন দেননি, পরিবর্তে তাঁর চরিত্র চিত্রায়ণে চিন্তার খোরাক রেখে গেছেন। কারণ শেষ পর্যন্ত জীবন রৈখিক নয়, এথিক্সের প্রশ্নেও অনেক সময় সঠিক উত্তরটি জীবনে প্রযোজ্য হয় না।

উপন্যাসটিতে নেল সামাজিক নিয়ম এবং প্রত্যাশা মেনে চলে যেখানে সুলা সেসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, প্রায়শই এমন আচরণ করে যা শহরের রক্ষণশীল মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে। সুলার জীবনে পাঠক পাবেন এক ধরনের অসংগতি, কিন্তু মনে করা যেতে পারে সেটি তার আত্ম-আবিষ্কারের পথে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অর্জন করার জন্য বিদ্রোহ, একজন নারী যিনি সামাজিক বিধিনিষেধকে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছাকে অনুসরণ করছেন। নাহার তৃণার অনুবাদে সুলার চরিত্রটি আমাদের কাছে মূর্ত—'সুলা অন্য সবার চেয়ে একেবারেই আলাদা। তার মধ্যে ইভার গোঁয়ার্তুমি এবং হান্নার স্বেচ্ছাচারিতা দুটোরই সহাবস্থান রয়েছে। এছাড়া রয়েছে তার অদ্ভুত সব কল্পনাবিলাস, সে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা কিছু চিন্তাধারা আর আবেগ নিয়ে দিন কাটায়। কাউকে খুশি করার প্রয়োজনবোধ করে না, যেটা তার নিজেকে আনন্দ দেয় সে তাই করে। সে যদি কষ্ট পেতে চায়, তাহলে কষ্ট পাবার পথ বের করে, সে যদি আনন্দ পেতে চায়, তাহলে আনন্দের পথ খুঁজে নেয়।' নৈতিকতা এবং সামাজিক নিয়মের সীমানা সম্পর্কে কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করে মরিসন আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন সঠিক ও ভুলের জটিলতা বিবেচনা করতে, নৈতিক বিধিমালার সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে।

মার্কিন একাডেমিক মহলে সুলা উপন্যাসটি নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। 'Form Matters: Toni Morrison's Sula and the Ethics of Narrative' নামে একটি গবেষণাপত্রে Alex Nissen লিখেছেন যে, মরিসন লেখার জন্য যে গঠনটি বেছে নিয়েছেন যেখানে কিছু নৈতিক প্রশ্নের পরোক্ষ উত্তর রয়েছে, যেমন কীভাবে মানুষ সমাজে একসাথে বেঁচে থেকে জীবনের নানান অনিশ্চয়তা এবং শূন্যতার মোকাবিলা করতে পারে। নৈতিকতার জন্য কোন ভিত্তিটি শক্তিশালী—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নাকি সমাজের সাধারণ নৈতিক শর্তাবলি? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে পাঠক মরিসনের লেখার সাথে এমন একটি ব্যাখ্যানির্ভর প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়বেন যেখানে

তিনি বুঝতে পারবেন দৈনন্দিন জীবনে সঠিক নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সবসময় সহজ নয়।

'সুলা'র কাল্পনিক শহরে মানুষের জীবনে বর্ণবাদ, দারিদ্র্য এবং সামাজিক প্রত্যাশার প্রভাব বর্তমান। এই প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটিকে বিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন সমাজের সামগ্রিক সাফল্য ও ব্যর্থতার রূপক হিসেবে গণ্য করা যাবে কি না জানি না, তবে ব্যক্তি ও ব্যক্তি এবং ব্যক্তি ও সমাজের সমচ্ছেদে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় সেটি সর্বজনীন, সেই আবিষ্কার আমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করছে। সেই সংঘাতগুলো অনেক সময় বর্ণিত হয়েছে কিছু করুণ হিংস্র ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ঘটনাগুলোকে মরিসন সাহিত্যের যন্ত্র (ডিভাইস) হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে একটি, ছোটবেলার এক মর্মান্তিক ঘটনা, যার জন্য সুলা এবং নেল দুজনেই দায়ী ছিল, নৈতিকতার প্রশ্নে এই উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি অনেকাংশে নির্ধারণ করে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় মরিসন যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা একাধারে কাঁচা ও কাব্যিক, প্রাণবন্ত ও উদ্দীপক। সেই ভাষাকে ভাষান্তরিত করা সহজ নয়, নাহার তৃণা অত্যন্ত মুনশিয়ানায় তা করতে পেরেছেন।

তাঁর নোবেল বক্তৃতায় টনি মরিসন এক জায়গায় বলেছিলেন—'আমরা মারা যাই। সেটাই হতে পারে জীবনের অর্থ। কিন্তু আমরা ভাষাও করি (ভাষার চর্চা করি)। সেটা হতে পারে আমাদের জীবনের মূল্যায়ন।' মরিসনের কাছে ভাষার ব্যবহার খুব মূল্যবান, সেটির অনুবাদও। নাহার তৃণা সেই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়ে আমাদের কাছে সফলতার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন মরিসনের কাজ।

দীপেন ভট্টাচার্য

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীর দেশে দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার সাহিত্যকর্মের সৃষ্টি হচ্ছে। সাহিত্যের কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। তবু সাহিত্যের খুব কম অংশই নিজ ভাষার গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য সীমান্তে পাড়ি দিতে পারে। ভাষার এই ব্যবধান ঘুচিয়ে একটি সাহিত্যকর্মকে অন্য ভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছানোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন একজন অনুবাদক। বহুবছর ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্তের অনুবাদকেরা বিশ্বসাহিত্যের রস ভিন্ন ভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

অনুবাদ একটি দুরূহ এবং ক্লান্তিকর কাজ। সাধারণ অনুবাদকর্মের চেয়ে সাহিত্যের অনুবাদ অনেকখানি আলাদা। সাহিত্যের অনুবাদ সহজ কাজ নয়। তবে এটি আদৌও সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে কি না তা নিয়ে পূর্বসূরিদের এক অংশ যেমন সংশয় দেখিয়েছেন; অন্য অংশ অকৃপণভাবে অনুবাদকে সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক মোজাফফর হোসেন 'অনুবাদ সাহিত্য : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে যা বলেছেন তার উল্লেখ হয়তো এখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'অনুবাদসাহিত্য সাহিত্যের চূড়ান্ত মর্যাদা পেতে পারে কি না এ নিয়ে একটা মৃদু তর্ক বা সংশয় এখনও অনেকের মনে রয়েই গেছে। এ তর্ক যাঁরা করেন তাঁরা উদ্ধৃত হিসেবে ব্যবহার করেন রবার্ট ফ্রস্টের সেই কথাটি—অনুবাদে যা হারায়, তাই কবিতা। অনেকটা একই কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। অনুবাদের বিপরীতে ইতালির প্রচলিত একটা প্রবাদ আমরা স্মরণ করতে পারি : Traduttore, traditore অর্থাৎ Translator, traitor যার জুতসই বাংলা করেছেন অনুবাদক-ভাষাবিদ হায়াৎ মামুদ 'তর্জমা-জোচ্চুরি'। এর কারণ হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন : 'পণ্ডিতজন প্রশ্ন করতে পারেন : ভাই, এটা কী হলো? বলা হচ্ছে Translator-traitor, আর তুমি করলে translation-treason? ঠিকই, অভিযোগে যুক্তি আছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করে তখন বলব, আমি মাছিমারা কেরানি হইনি, আমি আমার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়েছি।'

এই উন্নাসিকতার বিপরীতেও অনুবাদ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। বেনজামিন তাঁর 'দ্য টাস্ক অব দ্য ট্রান্সলেটর' প্রবন্ধে বলছেন, অনুবাদের কাজ হলো মূলের ঘাটতি কাটিয়ে উঠে একটা আদর্শ টেক্সটের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। অর্থাৎ

অনুবাদ মূলের চেয়েও খাঁটি। কথাটা বোর্হেস একটু ঘুরিয়ে বলছেন। তাঁর মতে, 'অনুবাদের জন্ম মূলের পরে হওয়ায় অনুবাদ মূলের চেয়ে বেশি আধুনিক এবং যে কারণে বেশি সভ্য।'

অনুবাদ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদের সংশয়হীন কথাগুলোও স্মরণযোগ্য, 'কোনো ভাষা শুধু মৌলিক সাহিত্যে সমৃদ্ধ হতে পারে না। যে-ভাষা যত ধনী, তার অনুবাদ সাহিত্যও ততো ধনী। আমাদের ভাষায় যা নেই, তা হয়তো আছে জর্মন ভাষায় বা ফরাসি ভাষায়। তাই আমাদের ভাষাকে আরও ঋদ্ধ করার জন্যে আমরা অপর ভাষা থেকে অনুবাদ করি।'

অনুবাদকর্মের সাথে জড়িত হওয়ার সুবাদে পূর্বসূরিদের কথা মাথায় রাখার চেষ্টা করি। সেক্ষেত্রে মাছিমারা কেরানি না হয়ে নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে, মূলের ঘাটতি কাটিয়ে, আদর্শ টেক্সটের কাছাকাছি পৌঁছানোর একটা চেষ্টা থাকে। তবে অস্বীকারের উপায় নেই কিছু সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। শুধু সংশ্লিষ্ট ভাষাটি জানলেই সাহিত্য অনুবাদ সম্ভব, তা নয়। কেননা এখানে ভাষার সাথে যুক্ত থাকে সংস্কৃতি। ভাষার দেয়াল ভাঙা সম্ভব হলেও সংস্কৃতির দেয়াল ডিঙানো অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই কাজটি যে অনুবাদক যত সুচারুভাবে করতে পারেন, তিনি ততটাই সফল অনুবাদক। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করার সময় গল্পের আবহটা এক থাকে না প্রায়শই। আক্ষরিক অনুবাদ করতে গেলে দেখা যায় মূল গল্প এবং অনুবাদের মধ্যে একটা সুরের ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। সেইসব ব্যবধান দূর করে একটা কষ্টসাধ্য পথ পাড়ি দিয়ে একজন অনুবাদক পাঠকের কাছে মূল গল্পের রসটুকু পৌঁছানোর চেষ্টা করেন।

টনি মরিসনের উপন্যাস 'সুলা', একমাত্র গল্প 'রেসিটেটিফ', 'গড হেল্প দ্য চাইল্ড' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত অংশ 'সুইটনেস' অনুবাদ করতে গিয়ে এই অনুবাদকের সামনেও মাঝে মাঝে সেধরনের কিছু বাধা এসেছে। সচরাচর যেকোনো অনুবাদে প্রথমে ভাবার্থ পরে শব্দের ওপর জোর দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে। এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেটি অনুসরণ করেছি। বিশ্বসাহিত্যের পাঠকের কাছে টনি মরিসন যথেষ্ট সমীহ আদায়কারী একজন সাহিত্যিক। তাঁর রয়েছে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক রচনাশৈলী। যা একাধারে জটিল এবং চিত্তাকর্ষক। টনির ব্যবহৃত ভাষার কুহক ব্যবচ্ছেদে যে অনুবাদক যতবেশি পারঙ্গম হবেন মূল কাহিনি তার অনুবাদে ততবেশি প্রাঞ্জল হয়ে ধরা দেবে। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, টনি মরিসনের সৃষ্টি অনুবাদ করতে যাওয়া এক স্পর্ধিত সাহসের কাজ। তাঁর বেশ কিছু রচনা পড়বার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় টনি মরিসনের লেখাজোখা খুব আয়াসসাধ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে কঠিনকে আয়ত্তে আনার কৌশল হিসেবে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের একটা কথা খুব কাজের। তাঁর মতে ভিনদেশি কোনো বই বোঝার সহজ পথ হলো সেই বইটি অনুবাদ করে ফেলা। টনির লেখাজোখা আরও বেশি বোঝার জন্য এবং তাঁর প্রতি জমে ওঠা মুগ্ধতা, এই অনুবাদে স্পর্ধা দেখাতে উৎসাহ দিয়েছে। সাথে

এও মনে হয়েছে এমন বিরলপ্রজ ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যিকের সৃষ্টির সাথে আমার মাতৃভাষার পাঠকের যতবেশি পরিচয় ঘটবে তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। এই ভাবনাও 'সুলা' অনুবাদের দুঃসাহস জুগিয়েছে।

পাঠক কেন এই অনুবাদ পড়বেন? বিষয়টা যদি এভাবে বলি, একটা সিনেমা দেখার সময় দর্শক যতই তার সাথে সংযোগবোধ করুন না কেন; সেটি শেষ হওয়ার পরপরই দর্শকের বোধের সেই সংযোগটা ছিঁড়ে যায়। তার হয়তো তখন মনে হয় পর্দায় এতক্ষণ যা কিছু দেখানো হয়েছে তার সবটাই তো বানানো, ওটা স্রেফ একটা সিনেমা। কিন্তু একটা বইয়ের অভিঘাত সেভাবে উবে যাবার নয়, যদি সেটি সুলিখিত হয়, হোক সেটা বাস্তব ঘেঁষা কিংবা কাল্পনিক কোনো কাহিনি ভিত্তিক। সেরকম একটি বই পড়বার অভিঘাত পাঠককের ভাবনার দরজায় টোকা দিতে সক্ষম হয়, পাঠকের ভেতর অনুপ্রাণিত হওয়ার ইচ্ছা জাগায়।

সেদিক থেকে প্রথমে পাঠক এবং পরে অনুবাদক হিসেবে আমার মনে হয়েছে সুলা পাঠকের মনে সেরকম অভিঘাত তৈরিতে সক্ষম। সুলা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালের দিকে, কিন্তু আজও তার আবেদন রয়ে গেছে। বিশেষত আমাদের মতো সমাজের নারীদের জন্য, যেখানে নারী এখনও পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতর বন্দি থাকতে বাধ্য। তার ব্যক্তিস্বাধীনতা কটাক্ষের বস্তু, যৌনস্বাধীনতা তো অনেক দূরের বিষয়। সুলায় আমরা কাহিনির কেন্দ্রে যে চারজন নারীকে দেখি তার মধ্যে নেল রাইট বাদে বাকি তিনজনই ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে ছিল। বিশেষ করে সুলা। ওই অত বছর আগের একটা বৈরী পরিবেশ, ঘৃণায় বিজবিজে সময়ে সুলা যেভাবে স্বাধীন সত্তা হিসেবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়েছে, আজকের সময়ে সেটা আরও বেশিমাত্রায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। স্বেচ্ছাচারিতা নয়, স্বাধীন সত্তা হিসেবে সততার সাথে সেই আকাঙ্ক্ষার যোগ্য হয়ে ওঠার বীজ হয়তো কোনো একজনের ভেতর বোনা হবে সুলার হাত ধরে।

বইটিতে উঠে এসেছে বিশেষ একটা সময়ের কাহিনি। অন্য সমাজ অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গির জনগোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠার একটা সুযোগ তৈরি করে দেয় এরকম বইগুলো। কোনো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের সরলীকরণ মনোভাবের বাঁক ঘুরিয়ে দিতেও হয়তো এটি সাহায্য করবে।

টনি মরিসনের লেখনী শুধুমাত্র ক্ষুরধারই নয়, একই সাথে বিষয় এবং উপস্থাপনায় থাকে নিজস্ব অভিনবত্বের চমক। থাকে অজস্র রূপক বা প্রতীক আর টুইস্টের কারুকাজ। 'সুলা' উপন্যাসেও যথেষ্ট মাত্রায় সেসব অনুষঙ্গ রয়েছে। আরও আছে অকপট ইরোটিক বা যৌন আলাপ। পাশাপাশি উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজে চলমান বৈষম্য আর তার বিরুদ্ধে একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রতিবাদের বিষয়। যদিও সেটি ছিল আত্মঘাতীমূলক।

'সুলা' টনি মরিসনের দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস 'দ্য ব্লুয়েস্ট আই' প্রকাশের তিন বছর পর ১৯৭৩ সালে 'সুলা' প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি জাতীয় বই

পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। সুলা খুব বড় উপন্যাস নয়। উপন্যাসটির চলন দুটি পর্বে গড়িয়েছে। যা উল্লেখযোগ্য সালের ভিত্তিতে শুরু এবং শেষ হয়েছে। উপন্যাসটি ছোট পরিসরের হলেও তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাহিনির ভেতর রয়েছে অনেকগুলো স্তর। স্তর হিসেবে যেমন এসেছে ছোট্ট এক শহরের কথা। আধুনিকরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে শহর বদলে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। সেখানে বসবাসরত পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতাহীন দুটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাতেও ঘটে নানা উত্থান-পতন। ফলে সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এমনকি নীতি নৈতিকতাতেও পরিবর্তনের আভাস দেখা দেয়। শহর বদলে গেলেও ভাগ্যের তেমন হের ফের হয় না স্থানীয়দের—বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর। বরং কারও কারও জীবনের ধারা থমকে যায়।

আরেকটি স্তর হিসেবে ভালো বনাম মন্দের কথা বলা যেতে পারে। এই দুটির টানাপোড়েন কাহিনির আখ্যান ঘিরে আবর্তিত। কিন্তু মোটা দাগে কোথাও বলার চেষ্টা নেই—এটা ভালো, ওটা মন্দ। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো চরিত্র সেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের ধার ধারেনি। সাফাই গাওয়ার জোরালো কোনো চেষ্টায় তারা ব্যস্ত থাকেনি। প্রবাহমান সময় কিংবা জলের মতো ঘুরে ঘুরে চরিত্রগুলোর জীবন আবর্তিত হয়েছে। ভালো-মন্দ, পাপ কিংবা পুণ্য-বিচারের ভার টনি তাঁর পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

নারীবাদী লেখক হিসেবে টনি মরিসনের একটা মজবুত অবস্থান রয়েছে। নারীকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে তুলে ধরার যে চেষ্টা তিনি তাঁর সমগ্র লেখক জীবনে করে গেছেন তার প্রতিফলন এই উপন্যাসেও অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশেষ করে নারীর যৌন স্বাধীনতার বিষয়টি, যা এখানে অসম্ভব স্বচ্ছতা নিয়ে উপস্থাপিত। হান্না পীসের যৌন স্বাধীনতার চিত্রণের ভেতর দিয়ে যার সূচনা।

আপাতদৃষ্টিতে সুলার গল্প দুই আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ নারীর সম্পর্ক এবং বন্ধুতার উত্থান-পতন নিয়ে। শৈশবে তৈরি হওয়া প্রিয় দুই বন্ধুর সম্পর্কটি যৌবনে ঘটনাচক্রে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যা সময়ে হয়ে ওঠে শত্রুর চেয়েও খারাপ। তা সত্ত্বেও শৈশবে এক বন্ধুর গোপন একটি কর্ম, যা দুর্ঘটনাক্রমে ঘটেছিল, সেটিকে অন্য বন্ধুটি মনের গহনে সযত্নে বয়ে বেড়িয়েছে। প্রকাশ্যে আনার অরুচিকর মানসিকতা দেখিয়ে বন্ধুত্ব নামের সম্পর্ককে অপমানিত হতে দেয়নি। এটিও এই উপন্যাসের চমৎকার সুন্দর একটা দিক। একই সাথে তৎকালীন সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত একটি জনগোষ্ঠীর জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নানা বাস্তব ঘটনা, সময়ের আবর্তনকে উপজীব্য করে টনি মরিসন তাঁর স্বতন্ত্র এবং জাদুকরী লেখনশৈলীর মোড়কে 'সুলা' নামের চমৎকার এই উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। গল্পে তৎকালীন আমেরিকায় বিদ্যমান কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের সমস্যা, কুসংস্কার, তাদের হিংস্রতা-মানবিকতার চিত্র যেমন উঠে এসেছে। সেসঙ্গে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের পার্থক্যের কথা, কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ

ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। অবধারিত কিছু বৈষম্যের কথাও এসেছে। এসেছে নীরবে ভালোবেসে যাওয়া এক প্রেমিক মানুষের কথা। সময় উজিয়ে ধরা দিয়েছে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার হিরণ্ময় আকুতি।

সুলা তৎকালীন সমাজের অন্যরকম এক সদস্য। প্রতিষ্ঠিত আচার আচরণ ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে ছিল তার অবস্থান। সে মেডেলিয়ন শহরের মহিলাদের সুশীলবাদী আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর এবং হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব পোষণ করত। সে ছিল একজন স্বাধীনচেনা নারী। তৎকালীন সমাজের চোখে যা একই সাথে ছিল বিস্ময় আর ধিক্কারের। কারণ প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতর বসবাস করা নারীরা ছিল পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থেকে অভ্যস্ত। সংসার বৃত্তে আটকে থেকে জীবন পার করাই ছিল সাধারণের চাওয়া। সুলা সেখানে ব্যতিক্রম। যে তার সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার বদলে বিদ্যমান অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান ঘোষণা করে। সুলা একটি বৈষম্যমূলক সমাজের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহে তার কোনো সঙ্গী ছিল না। প্রিয় বন্ধুটিও তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। কারণটিও সুলার নিজের হাতে তৈরি। ফলে তাকে রণক্ষেত্রে এক নিঃসঙ্গ ক্লান্ত সৈনিক হিসেবে দেখা যায় উপন্যাসের শেষ পর্বে।

দৃশ্যত পরাজয় মনে হলেও সুলা কি সত্যি পরাজিত হয়েছিল? নাকি পরাজিত হয়েছে সেই সমাজ যারা সুলাকে মেনে নেয়নি? প্রচলিত সমাজের পক্ষে সুলার মতো বৈপরীত্বে ভরপুর একটি চরিত্রকে মেনে নেওয়া কঠিন। ফলে তাকে সবাই নিঃসঙ্গ করে রেখেছিল। তবু সুলা সকল অক্ষমতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। সেটি নেবার মুহূর্তেও সমাজের প্রতি বিদ্রুপ ছুড়ে দিয়েছিল। মাথানত করেনি শেষ পর্যন্ত। সমাজের কাছে অচ্ছ্যুত হয়েও সুলা প্রমাণ করেছে সমাজ তাকে ত্যাজ্য করার আগে সে নিজেই সমাজকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করছে। ওখানেই সুলা জিতে যায়।

উপন্যাসটি ইংরেজিতে লেখা হলেও তাতে স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের মধ্যে প্রচলিত এমন কিছু ভাষা এবং জটিল-অপ্রচলিত, অনেক মেটাফর ব্যবহৃত হয়েছে যা বুঝতে অনেকটা হিমশিম খেতে হয়েছে। আগেই বলেছি সাহিত্যের অনুবাদে প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায় সংস্কৃতি। প্রতিটি ভাষার এমন কিছু কিছু সুর আছে, তাল আছে, যার সবটুকু অনুবাদযোগ্য নয়। এখানেও তাই হয়েছে, যেকারণে ক্ষেত্রবিশেষে ভাবানুবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তবে তাতে মূল গল্পটি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই ব্যাপারে সবসময় সচেতন থাকার চেষ্টা ছিল। কিছু জায়গায় প্রমিত ভাষার বদলে বাংলাদেশে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে পাঠকের কাছে পরিস্থিতির আমেজটা পৌঁছানো এবং একই সাথে চরিত্রের অবস্থানগত বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। দীর্ঘ এবং সুরময় বাক্য ব্যবহার করা টনি মরিসনের বিশেষ আরেকটি বৈশিষ্ট্য। পড়তে আরাম হয় এই চিন্তা মাথায় রেখে অনুবাদের বেশ অনেকটা ছোট ছোট বাক্যে সাজানো হয়েছে। প্রচুর বড় বড় বাক্য

আছে যেগুলো ভাঙলে মূল সুরে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, এমন মনে হওয়ায় লেখকের রীতি ধরেই অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু শব্দের আক্ষরিক বাংলা করতে গেলে হয়তো গল্পে ছন্দপতন হতে পারে ভেবে সেখানে টনির ব্যবহৃত শব্দ কিংবা তার বিকল্প শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য প্রাসঙ্গিক টীকা দিয়ে সেইসব অংশকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'সুলা' উপন্যাসটি টনি মরিসনের আত্মজৈবনিক উপন্যাস নয়। কিন্তু উপন্যাসের রচনাকালে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উপন্যাসটির সৃষ্টিপর্বে প্রভাব বিস্তার করেছে যা লেখক নিজেই বলেছেন ভূমিকাপর্বে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে উপন্যাসের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। প্রতিটি মহৎ উপন্যাসে লেখক তাঁর পাঠকদের উদ্দেশে একটা বার্তা দেবার চেষ্টা করেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমার এই অনুবাদ প্রচেষ্টায় সেই অন্তর্নিহিত বার্তা বাংলা ভাষায় প্রকাশে কতটা সফল হয়েছে তার বিচারের ভার পাঠকের ওপর রইল।

টনি মরিসনের উপন্যাস সুলা সম্ভবত বাংলা ভাষায় এখনও অনূদিত হয়নি। সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বে কিছু ভুলত্রুটি হয়তো রয়ে গেল। তার জন্য পাঠকের কাছে সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

নাহার তৃণা
শিকাগো, ইলিনয়
৩১ মে, ২০২৩

'Nobody knew my rose of the world
but me... I had too much glory.
They don't want glory like that
in nobody's heart'

—The Rose Tattoo

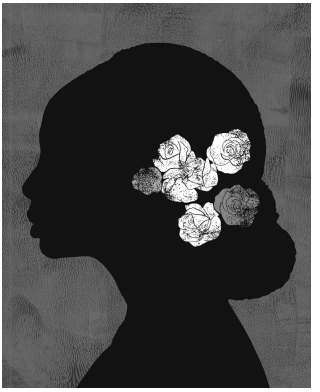

সুলা

শুরুর কথা

পঞ্চাশের দশকে আমার ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক মানসিকতার লেখক বলে অভিহিত হওয়াটা একটা বিব্রতকর ব্যাপার ছিল। এটা এতই তীব্র ছিল যে সামাজিক বিষয়গুলোর দিকে কারও সৃজনশীলতাকে এত গভীরভাবে প্রচার করার ফলে যে সমালোচনামূলক উপহাসের ভয় এসে উপস্থিত হতো তা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। কিন্তু কীসের এত ভয়? কারও কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রকাশিত হওয়া সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থেকে উড়ে আসা আতঙ্কের উৎস এবং লেখকদের জন্য একে সহজ করার উপায়গুলোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। সাহিত্যে সামাজিকভাবে বিচক্ষণ কিংবা, রাজনীতি সচেতন হওয়া দোষের হবে কেন? প্রচলিত মত অনুসারে রাজনৈতিক কথাসাহিত্য শিল্প নয়। এই ধরনের কাজের নান্দনিক মূল্য থাকার সম্ভাবনা কম। কারণ রাজনৈতিক এজেন্ডার উপস্থিতি সাহিত্যের নান্দনিক উপস্থাপনাকে দূষিত করতে পারে।

সেই প্রজ্ঞা, যা চসার, বা দান্তে, বা ক্যাটুলাস, বা সোফোক্লিস, অথবা শেকসপিয়র, কিংবা ডিকেন্সের কাছে অনুপস্থিত ছিল বলে মনে করা হতো, যা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য, ১৯৬৯ সালে এটি আফ্রিকান আমেরিকান লেখকদের ওপর একটি অস্বাভাবিক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। তারা কোনো ধরনের রাজনীতির বিষয়ে পুরোপুরি অনাগ্রহী কি না অথবা তারা কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস লালন করে কি না অথবা তারা নিজেদের গোত্রের বিষয়ে হিংস্রতা প্রকাশ করে কি না কিংবা তাদের চরিত্রের মধ্যে নিজেদের ব্যাপারে 'শুধু রাজনৈতিক' কোনো বিবেচনা কাজ করে কি না, সেসব বিষয় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হতো। ফিলিস হুইটলি যদি 'আকাশটা নীল' লিখেন, তাহলে সমালোচকরা প্রশ্ন তোলেন একজন কালো দাস মহিলার কাছে নীল আকাশের অর্থ কী হতে পারে? জিন টুমার যদি 'লোহাটা গরম' লিখে থাকেন তবে প্রশ্ন ওঠে তিনি কতটা সঠিক বা খারাপভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল প্রকাশ করেছেন। এই চাপটা কেবল সমালোচকদের ওপর ছিল তা নয়, পাঠকের ওপরও ছিল। একজন কৃষ্ণাঙ্গ লেখকের সাহিত্যকর্মকে অনুধাবনের জন্য যেকোনো গোত্রের পাঠক নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করেন? পাঠক কি সবসময় একটা উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন, সেখানে নিজের বিষয়ে কতটুকু উন্মোচিত করা হয়েছে সে ব্যাপারে?

১৯৭০ সালে, যখন আমি সুলা লিখতে শুরু করি, তখন আমি ইতোমধ্যেই আমার প্রথম উপন্যাস দ্য ব্লুয়েস্ট আই-তে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ উভয় সমালোচকদের

মন্তব্য পড়ার হতাশাজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, সে ব্যাপারে দুয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া—মূল্যায়নগুলো উপেক্ষা করার কোনো শক্তি আমার ছিল না যেখানে 'শুধুমাত্র নান্দনিকতা' মানদণ্ডটি জিতে যায়। যদি উপন্যাসটি ভালো হয়, তখন বলা হয় এটা অমুকপন্থি রাজনীতির প্রতি বিশ্বস্ত। যদি খারাপ হয় তখন বলা হয়, এখানে তমুক রাজনীতির প্রতি বিশ্বাসের অভাব আছে। সাহিত্যকর্মের প্রতি এই রায়গুলো 'কালো মানুষরা এরকম কিংবা কালো মানুষেরা ওরকম' তার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। আমি এ ধরনের প্রশংসাগুলোর জবাব দিয়েছিলাম। তবে হালকা ধরনের অগভীর মতামতগুলোকে উপেক্ষা করেছিলাম। আবার বিবরণগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছিলাম যা ইতোমধ্যে তার নিজের অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

আমি জানতাম, আমি যদি আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে যাই, তার প্রতি অল্প কিছু মানুষই আগ্রহী হবেন। হতে পারে প্রথম বইটি কিনেছিলেন যে পনেরশ পাঠক তার ক্ষুদ্র শতাংশ মাত্র। কিন্তু লেখার কাজটি ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটি পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, সে কাজ কত কম গুরুত্ব পেল সেটা কোনো ব্যাপার ছিল না। একজন লেখকের বইটা পড়ার চেয়ে একটা সমস্যার সমাধান করাকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারটা দেখতে কেমন লাগে সেটা এখন বোঝানো কঠিন।

জেমস বল্ডউইন, রাল্ফ এলিসন, রিচার্ড রাইট, জোরা নিল হারস্টন—সবাইকে 'নিগ্রো' লেখক হওয়ার 'সমস্যা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার আহ্বান জানানো হয়েছিল। সেই 'না জেতা' পরিস্থিতিতে—যারা রাজনৈতিকভাবে প্রতিনিধিত্বশীল ক্যানভাস খুঁজছেন তাদের কাছে দায়িত্বজ্ঞানহীন সেই শব্দগুলো কতটা 'নৈতিক' ছিল সেটার মূল্যায়নে আমার কাছে একমাত্র উপায় ছিল আমার নিজের সংবেদনশীলতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। আমার নিজের আগ্রহ ছিল আরও প্রশ্ন এবং আরও চ্যালেঞ্জের অনুসন্ধান। যেহেতু আমার সংবেদনশীলতা অত্যন্ত রাজনৈতিক এবং আমি শৈল্পিকভাবে আবেগপ্রবণ, আমি কারও কাছে কোনো অজুহাত দিতে রাজি নই। আমি বিষয়টার মধ্যে যে শিল্প আছে সেটা ছাড়া অন্য সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করেছিলাম। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো পুরুষদের কোনো মধ্যস্থতা ছাড়া নারীদের মধ্যে বন্ধুত্ব বিষয়টা কেমন? তাদের নিজস্ব সমাজের অনুমোদনের বাইরে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের পছন্দের বিষয় কোনগুলো?

নারী স্বাধীনতা মানে সর্বদা যৌন স্বাধীনতা, এমনকি বিশেষ করে যখন এটি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রিজমের মাধ্যমে দেখা যায়। হান্না পীসের যৌন স্বাধীনতার মাধ্যমে আমি গল্পের মূল অংশে প্রবেশ করি। যেখানে স্থানীয় মহিলারা একজন নারীকে যে চোখে দেখে সেটা আছে, সেই সাথে আছে তার প্রতি তাদের ঈর্ষা ও সমীহের যুগপৎ অবস্থান। তার মধ্যে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনচেতা চরিত্রটা দেখা যেত, সেটা ছিল একাধারে সনাতন ধাঁচের এবং তাতে কোনো নিয়মশৃঙ্খলার ব্যাপার ছিল